Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 284 – 290
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বাংলার প্রহসনে পাশ্চাত্য প্রভাব

জয়িতা বসাক
SACT, ফরাসি বিভাগ
চন্দন নগর কলেজ
ইমেইল : **basakjayita18@gmail.com**

Keyword
বাংলার নবজাগৃতি, ইউরোপীয় রেনেসাঁস, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, সাংস্কৃতিক বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, প্রহসন, মলিয়্যার।

Abstract
বাংলার নবজাগৃতিকে আমরা সাধারণত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই ভালবাসি। নবজাগৃতির ফলে ইউরোপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যে অভূতপূর্ব জীবন উল্লাসের সমারোহ দেখি, তার হুবহু প্রতিফলন বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে অনুসন্ধান করে পরিতৃপ্ত হই। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল কথাই হল সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব। সমাজে নতুন শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল – অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, (সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি) নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। পুরোনো শ্রেণীবিন্যাসকে পরিবর্তিত করে এই নতুন বিন্যাস সহজে লাভ হয়নি। কোনো দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত করা সহজ ব্যাপার নয়। বাংলা নাটকের রূপান্তর হচ্ছিল ধীরে ধীরে। একদিকে যেমন নাট্য জগতের কিছু ঘটনা প্রবাহ সৌখিন নাট্যশালার পালা শেষ করে পেশাদার মঞ্চ যুগের সূত্রপাত করেছিল, অন্যদিকে বাংলার সামাজিক জীবনে চিন্তাধারায় পরিবর্তনের ফলে নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও পালাবদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। রেনেসাঁসের এই বিশেষত্বগুলো বাঙালীর পক্ষে করায়ত্ব করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো আন্দোলনে নামেনি, একথা কিন্তু বলা চলে না (যেমন নীলবিদ্রোহ)। এই সময়ের বাঙালীর চিন্তা বা উদ্যমের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়েছিল সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বাঙালী নবজাগৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথার্থই প্রচুর পরিবর্তন এনেছিল – তার মধ্যে বাঙালীর রচিত সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্য এই পরিবর্তনের স্বাক্ষরবাহী । প্রথম অভিনীত মৌলিক বাংলা নাটক – 'কুলীন কূলসর্বস্ব' (রামনারায়ণ তর্করত্ন) প্রসহন। প্রহসনই সম্ভবত বাংলা নাট্যসাহিত্যের একমাত্র ভাগ বা শ্রেণী যা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শ লাভ করেছে। প্রতীচ্য নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্রহসনের সূত্রপাত অনেক আগে। সপ্তদশ শতকে ট্র্যাজেডি আর কমেডি নাট্য সাহিত্য এমন ভাবে অবস্থান করছে যেন একই মুদ্রার দু'দিক। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখক (Molière) মলিয়্যার এবং ট্র্যাজেডি লেখক রাসিন (Racine) ছিলেন সমসাময়িক।

Discussion

বাংলা সাহিত্য, সেই সঙ্গে বাংলা নাটক, যেহেতু বাংলার নবজাগৃতির অন্যতম ফসল, সেহেতু বাংলা নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার নবজাগৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাংলার নবজাগৃতিকে আমরা সাধারণত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই ভালবাসি। নবজাগৃতির ফলে ইউরোপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যে অভূতপূর্ব জীবন উল্লাসের সমারোহ দেখি, তার হুবহু প্রতিফলন বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে অনুসন্ধান করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমাদের বিশ্লেষণগুলি হয় বাহ্যিক, যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজতন্ত্রকে সরিয়ে নবোদিত বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়কে প্রকাশ করেছিল– এই সহজ সত্যটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে যে নবজাগৃতির সূচনা উনবিংশ শতকে দেখা দিয়েছিল, তাতে কোনক্রমেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাববিপ্লব বলে গ্রহণ করা চলে না।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল– অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, (সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি) নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল। বিশেষত কার্ল মার্ক্সের বিখ্যাত Structure-Super Structure Theory, যেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো নিম্নতম বুনিয়াদ এবং শিল্প-সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা উপরিভাগের ব্যাপার– নবজাগৃতির প্রাণধর্ম বিশ্লেষণে সুধীজন স্বীকৃত এই তত্ত্বটি অনস্বীকার্য।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল কথাই হল সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব। সমাজে নতুন শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে। পুরোনো শ্রেণীবিন্যাসকে পরিবর্তিত করে এই নতুন বিন্যাস সহজে লাভ হয়নি। কোনো দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত করা সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং ক্রমাগত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস এনেছিল জ্ঞানে ও কর্মে মুক্তি – যার উভয়মুখী সংমিশ্রণে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে হয়েছিল বিরাট অগ্রগতি। নবজাগৃতির যুগে বাঙালীর কর্মে অধিকার ছিল না। তারা ছিলেন মূলত চাকুরীজীবী ও জমির উপস্বত্বভোগী। তাই কর্মেমুক্তি বাঙালীর আসেনি। ফলে মুক্তি সর্বাঙ্গীন হতে পারেনি। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বুর্জোয়া মধ্যবিত্তের সঙ্গে তাদের ছিল গুণগত পার্থক্য। বহুমুখী বিস্তারের ফলে যে বিপুল কর্মোদ্দীপনা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানুষ প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করেছিল, তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল এলিজাবেথীয় নাট্য সাহিত্যে। রেনেসাঁসের এই বিশেষত্বগুলো বাঙালীর পক্ষে করায়ত্ব করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো আন্দোলনে নামেনি, একথা কিন্তু বলা চলে না (যেমন নীলবিদ্রোহ)। এই সময়ের বাঙালীর চিন্তা বা উদ্যমের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়েছিল সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বাঙালী নবজাগৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথার্থই প্রচুর পরিবর্তন এনেছিল– তার মধ্যে বাঙালীর রচিত সাহিত্য তথা নাট্যসাহিত্য এই পরিবর্তনের স্বাক্ষরবাহী। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' রচনার মাধ্যমে মৌলিক নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত। তারপর রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের হাতে নাটকের যৌবন প্রাপ্তি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যুগের শুরু। পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ পর্যন্ত – নাটকের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি হয়। ১৯১২ বা ১৯১৩ সাল নাগাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষের, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিরোধানের পর এই পর্বের সমাপ্তি ধরা যেতে পারে। ১৯১২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বলা যেতে পারে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে গতানুগতিকতার যুগ– একালের নাট্যকারেরা গিরিশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যরীতিকে অতিক্রম করতে পারেনি, ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৪২ সালের পর থেকে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠলো তার রচনারীতি ও বক্তব্য বিষয়েও গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল।

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক নাটক যখন রচিত হতে শুরু করেছিলো তখন নবজাগৃতির তরুণকাল। ইংরেজদের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর সম্পর্ক তখন অতি মসৃণ ছিল। তাছাড়া প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান – যার প্রভাবে বাঙালীর মানসমুক্তি

ঘটেছিল – যেমন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কার প্রয়াস, রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মান্দোলন, শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিরলস শ্রম এবং অপর দিকে ইয়ংবেঙ্গলের বাঁধন ছেঁড়া জয়োল্লাস – এই উভয় কোটির কর্মোদ্যমের প্রথম কথাই ছিলো উদার মানবতাবাদের উদ্বোধন ও প্রাচীন প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে অস্বীকার।

ইংরেজের যে Law and Justice এর মাহাত্ম্যে শিক্ষিত বাঙালী মুগ্ধ ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাতে সেই Law and Justice–এর অপপ্রয়োগ দেখে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শিক্ষিত বাঙালীরা কিন্তু তাতে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে বিপ্লবের পথে গেলেন না। তারা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবাদের রাস্তা নিলেন– যেমন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

বাংলা নাটকের রূপান্তর হচ্ছিল ধীরে ধীরে। একদিকে যেমন নাট্য জগতের কিছু ঘটনা প্রবাহ সৌখিন নাট্যশালার পালা শেষ করে পেশাদার মঞ্চ যুগের সূত্রপাত করেছিল, অন্যদিকে বাংলার সামাজিক জীবনে চিন্তাধারায় পরিবর্তনের ফলে নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও পালাবদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলা' প্রবর্তনের বছরেই রচিত হয়েছিল রামমোহন বসুর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক নাটক'। তৎকালীন 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'-র প্রস্তাবিত কার্যাবলীর মধ্যে ছিল 'দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা'। অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রতিচ্যমুখীনতা নাট্যকলায় বর্জন করাই ছিলো এর মূল উদ্দেশ্য। মনোমোহন বসুর প্রথম নাট্যরচনায় এই উদ্দেশ্য প্রতিফলনের প্রচেষ্টা অলক্ষণীয় নয়। এই প্রথম বাংলা নাটকে সাহিত্য মহাকাব্য ও পুরাণ অবলম্বনে পৌরাণিক নাট্যরচনার সূত্রপাত হল। পৌরাণিক নাটকের মূল অবলম্বন ভক্তিরস। এর আগে মহাকাব্য বা পুরাণ অবলম্বনে যে সকল নাটক রচিত হয়েছিল, তা ভক্তিরসাশ্রিত ছিলো না, তাতে ছিল মানবমুখীনতা, মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক– এরই প্রমাণ।

মনোমোহন বসু ঘোষণা করলেন –

> "আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাহারা এই সংস্কারের বশ্যতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশী সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও স্বদেশী রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে স্থানে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নহিলে চলে না। ... যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্তন, ঢপ, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী ... বাউলের গান প্রভৃতি বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন ... সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?"[১]

মনোমোহন বসু এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতাটি ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বাৎসরিক সভায় বলেছিলেন।

এই উদ্ধৃতিটি আলোচনা বা অনুধাবন করলে কয়েকটি বিষয় ভীষণ ভাবে স্পষ্ট হয়, যেমন বাঙালীর নাট্যরচনা ইংরেজ আদর্শে হওয়া উচিত নয়। কেননা স্বদেশী রুচি ভিন্ন। আমাদের নাটক লোকনাট্য বা যাত্রার আদর্শে রচিত হওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজন নাটকে গীতি বাহুল্য। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধনের মাধ্যমে এই নতুন যুগের পদসঞ্চার হয়। এই সময় থেকেই বাংলা নাটকের অন্তরসত্তার ঘটে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন। তাই যা কিছু দুষ্প্রবৃত্তিসাধক এবং ধর্মনীতিঘাতক – তা মনোমোহন বসুর ভাষায় কঠোর ভাবে ধিকৃত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করেছিলেন –

> "জাতীয় বৃত্তি পরিচালন ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম ধর্ম। দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্মিক। ... হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"[২]

মনোমোহন বসুর প্রচেষ্টা ও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে লোকরুচিপ্রিয় এই ধর্মবোধ নাটকে রূপান্তরিত হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পরিবেশিত হতে লাগলো।

১৮৭২ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠাকাল। এই পর্বে সৌখিন নাট্যশালা বিলুপ্ত না হলেও পেশাদারী মঞ্চের তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। এই পেশাদার মঞ্চ অবলম্বনেই বঙ্গরঙ্গ জগতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান নাট্যকারগণ আবির্ভূত হলেন। এই পর্বের নাট্যকারগণের উদ্দেশ্য ছিলো গঠনমূলক, প্রাচীনপন্থা বিরোধী ও সংস্কারপন্থী। প্রচলিত ধর্মবোধ অপেক্ষা জীবনধর্ম প্রকাশই এই পর্বের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের নাটকগুলি আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন –

১) রোমান্টিক নাটক – যার মুখ্য অবলম্বন জীবননিষ্ঠ প্রেম, যেমন – 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ইত্যাদি।

২) ঐতিহাসিক নাটক – ইতিহাসের জটিল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পতিত অসহায় মানব মনের প্রকাশ, যেমন –'কৃষ্ণকুমারী'

৩) সামাজিক নাটক – অতীতের অন্ধ আনুগত্য অস্বীকার করে নবযুগের যে সংস্কারমুখী সমাজ আন্দোলন, এ শ্রেণীর নাটকগুলোয় তারই রূপান্তর, যেমন – 'কুলীন কুলসর্বসব বা 'বিধবা বিবাহ আইন'।

৪) প্রহসন – এ শ্রেণীর নাটকে পূর্ববর্তী শ্রেণীর নিকট আত্মীয়, শুধু মেজাজে পৃথক । অর্থাৎ সংস্কারমুখী সমাজ আন্দোলনে বিশ্বাসী নাট্যকারগণ এখানে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ অ ব্যাঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের চেতনা সম্পাদনে আগ্রহী, যেমন – 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বা সধবার একাদশী'।

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু 'প্রহসন'। সমাজ সমস্যামূলক নাটককে বিষয়বস্তু ও প্রবণতা অনুযায়ী দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। নাট্যকার যেখানে সমাজ জীবনের গভীর ও জটিল রূপ অঙ্কনে আগ্রহী, তাকে আমরা সামাজিক নাটক বলে থাকি। আর যখন সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও অবিচার নাট্যকারের ব্যঙ্গবিদ্রূপকে উদ্বোধিত করে তুলেছে, নাটক তখন প্রহসনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পণপ্রথা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটক সম্পর্কে অমৃতলাল বসু বলেছিলেন–

> "মশায়, এমন Powerful নাটক লেখা আপনার দ্বারাই সম্ভব । Marriage Problem নিয়ে আমি একটা farce করেছি, আপনি তা নিয়ে এত বড় একটা Tragedy করলেন।"[৩]

তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার বা অবস্থান যে খুব একটা সুখকর ছিল না, সেটা আমাদের সকলেরই জানা। আর এই অধিকারের মর্যাদা বা নারীর প্রাপ্য সম্মানটুকু যথাযথ মর্যাদায় ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে এই সময়ের প্রহসনের গুরুত্ব অপরিহার্য। বিষয়ের পর এবার আসা যাক প্রহসনের গঠনের উপর – বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ প্রহসনই স্যাটায়ার (Satire)। স্যাটায়ার সাধারণতঃ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্বভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এই তীক্ষ্ণতা অবয়বগত বিস্তৃতিতে বৈদ্যুতি হারাতে পারে। তাই নাট্যকারগণ সচেতন ভাবে প্রহসনের অঙ্কবিন্যাসে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন। সাধারণত দেখা যায়, প্রহসনের প্রথম অঙ্কে ব্যঙ্গের বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে তার সকল উৎকেন্দ্রিকতাকে নাট্যকার নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করে থাকেন। ফলে নাট্যক্রিয়ার উত্থান পতনে একটি আশ্চর্য সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেখানে নাট্যকার দুই অঙ্কের বিভাগ মেনে চলেননি, যেমন- দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ত্রহ্যস্পর্শ'।

প্রহসন দিয়ে আধুনিক বাংলা নাটকের শুরু। প্রথম অভিনীত মৌলিক বাংলা নাটক– 'কুলীন কূলসর্বস্ব' (রামনারায়ণ তর্করত্ন) প্রসহন। প্রহসনই সম্ভবত বাংলা নাট্যসাহিত্যের একমাত্র ভাগ বা শ্রেণী যা প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রতিভাস্পর্শ লাভ করেছে। উনিশ শতকের বিখ্যাত সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন

> "... আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহসন অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা নাটক গণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন; কিন্তু দত্তকৃত 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ।"[৪]

কাজেই এই সময়ে প্রহসনের অনুকূল পরিবেশ ছিল বলা চলে।

প্রতীচ্য নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্রহসনের সূত্রপাত অনেক আগে। সপ্তদশ শতকে ট্র্যাজেডি আর কমেডি নাট্য সাহিত্য এমন ভাবে অবস্থান করছে যেন একই মুদ্রার দু'দিক। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখক (Molière) মলিয়্যার এবং ট্র্যাজেডি লেখক রাসিন (Racine) ছিলেন সমসাময়িক, অপর দিকে স্পেনের থেরভেনতেস (Therventhese) ও

লোপে দ্য ভেগা (Lope de Vega) – কমেডি ও ট্র্যাজেডি লেখকদ্বয়ও একই সময়ে আবির্ভূত হন। সর্বোপরি রয়েছেন শেক্সপীয়র (Shakespeare)। নাট্যকারেরা বলছেন –

> "the dramatist has focused on the beautiful or the ugly, on the orderly or the chaotic, on what is best or what is worst in the world."[৫]

অর্থাৎ কোন নাটকে 'the beautiful and the orderly tends towards an idealized vision of the world' - এর উপর জোর দেওয়া হলে তাকে 'romance' বলা চলে এবং 'Ugly and chaotic tends towards the debased view of the world' -এ আলোকপাত করলে তা Satire হতে বাধ্য হয়।

তাই আমরা বলতে পারি প্রহসনকার অত্যন্ত সমাজসচেতন। আরিস্তোফেনিস বা মলিয়্যার যখন কোনো চরিত্রকে ব্যঙ্গের বিষয় বলে নির্বাচিত করেন তখন তার সামাজিক তাৎপর্য তারা কখনই বিস্মৃত হন না। যেমন Harpagon চরিত্রটি রূপায়িত হয় মলিয়্যারের 'আভার' (Avare) নাটকে, এমন একটি মানুষ যার মাধ্যমে মলিয়্যার কৃপণতাকে অন্য মাত্রায় দেখিয়েছেন, যা একদিকে হাস্যকর অন্যদিকে শিক্ষণীয় চরিত্র। Tartuff-এর কালজয়ী চরিত্র হয়তো বলেই তৈরী করেছিলেন – যা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।

> ''Moliere is the supreme anti-romantic and all his work is a defence of the social order against in the reads of indivisualism. He ruthlessly tears down the meritorious veil which foold, hypocrites and romantics would interpose between man and reality of his life... Moliere talks to the plain man in the language which understads , the language of claim common sense...Freedom for him is not the right to sacrifice society to one's soul in a blind subservience to the demands of the crowd. Freedom is for Moliere a very sacred thing... He pointed out that the function of the comic outher was not to satirise ideals, but the vicious distertion of ideals.''[৬]

- এটি প্রফেসর F.C. Green এর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য। মলিয়্যারের নাটকে বুদ্ধির দীপ্তি বিশেষভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

> "Au début d'aout 1664, Molière vient d'adresser, sans beaucoup d'illusions, son premier placet au Roi à propos du Tartuffe, et, comme il ne s'attend pas à ce que l'interdiction soit levée à brève échéance, il lui faut combler au mieux le vide crée à l'affiche par l'interdiction d'une pièce dont le succès était assure. Sans doute est-il contraint d'achever plus rapidement que prévu la pièce qu'il a mise en chantier quelques mois plus tôt, et qui reprend le thème a la mode de Dom Juan."[৭]

(১৬৬৪ এর শুরুতে মলিয়্যার সবার প্রথমে রাজার কাছে তাঁর নাটক Tartuffe কে উপস্থিত করেছিলেন কোন রকম ভ্রান্ত ধারনা ছাড়াই এবং তিনি কোন রকম বাধার সামনে থেমে থাকেন নি। নিজের কলাকে যতটা সম্ভব সফলতা প্রদান করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। খুব তাড়াতাড়ি তিনি Dom Juan এর বিষয়টিকে নাটকে রূপান্তরিত করবেন। অনুবাদ লেখিকা স্বয়ং)

মানুষের চরিত্রগত দুর্বলতা নিয়ে মলিয়্যার এর তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। মলিয়্যারের শাসনের কশাঘাত করে ছেন নির্মম ভাবেই, ক্ষমাকে সরিয়ে রেখেছেন বহু যোজন দূরে। চরিত্রে যে সব দুর্বলতা মানুষকে অন্ধকার, অসামাজিক করে তোলে, মলিয়্যারের খোঁচা দিয়ে সে সব দুর্বলতা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করেছেন। মলিয়্যারের নাটকে যে সুত্রের প্রাধান্য হল – ক) বেশভুসা ও প্রচেষ্টার অসংগতি, খ) বাক্যগত অসংগতি, গ) ঘটনার অসংগতি, ঘ) ব্যাক্তি চরিত্র এর অসংগতি অ তার জিবনের এবং সমাজের সঙ্গে পারস্পারিক সংযোগ। মলিয়্যার ছিলেন বাস্তব ধর্মী নাট্যকার। সমাজ জীবন তথা ব্যাক্তি জীবনে যে কোন ধরনের উৎকেন্দ্রিকতা, অতিচারিতা তিনি সহ্য করেন নি। সমাজের কল্যাণকর শাশ্বত রূপেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ তার ব্যাক্তিগত স্বার্থ, লোভ, কপটতা, বোকামি এবং দুরাশা প্রভতির বশবর্তী হয়ে সমাজের কল্যাণকর নীতি যখনই অতিক্রম করতে ছেয়েছে, তখনই তার আচরণ অশোভন, অসঙ্গত ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে। আবার সমাজে যারা ধর্মনীতির নামে প্রতারিত করেছে, মলিয়্যার তাদের ক্ষমা করেন নি। মলিয়্যার ব্যাক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে স্বাধীনতার পূজারী। সমাজনীতির নামে যারা অজ্ঞ জনকে প্রতারিত করেছে

মলিয়্যার মানুষের সামনে তাদের মুখোশ একটানে খুলে দিয়েছেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত হাসির পাশাপাশি সমাজের কুপ্রথা, ভণ্ডামি কপটতার বিরুধে মলিয়্যার তীব্র তীক্ষ্ণ ভাবে যে শাণিত কলম চালিয়েছেন, তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট নাটক গুলিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তার কারণ সমসাময়িক কালের বাংলাদেশের সমাজ ও ব্যাক্তি জীবনের ছবিটা ছিল অনেকটাই অস্থির। সেই অস্থিরতার মুখ চেয়েই প্রহসন গুলি রচিত ও অভিনীত হয়। বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য – পাশ্চাত্য' গ্রন্থে ফরাসী শিল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে ছিলেন। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর লেখার মাধ্যমে। ফরাসী ভাষা থেকে তিনি নানান অনুবাদ করেন। এভাবে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ গাঢ় হয়।

আরিস্তোফেনিস-এর কমেডিগুলোতে Aristotale–এর কমেডির সংজ্ঞা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন–

> "Comedy is an imitation of characters of a lower type – not, however, in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a subdivision of the ugly."[৮]

প্রহসনে বিশেষ কোনো চরিত্র থাকে আমরা 'characters of lower type' বলছি, ব্যঙ্গের মাধ্যমে যে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে প্রহসনকে আরও সার্থক করে তুলছে।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম না করলেই নয়। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে সামান্য স্যাটায়ারের ছোঁয়া থাকলেও 'এমন কর্ম আর করবো না' (পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত ১৮৭৭) থেকে তিনি ভিন্নতর হাস্যরসের সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। একদিকে অলীক প্রকাশের চালিয়াতি, অন্যদিকে হেমাঙ্গিনীর মাধ্যমে বঙ্কিম-নায়িকার ভাব – একাধারে প্রকাশ করেছেন। এই প্রহসনে প্রসন্ন (হেমাঙ্গিনীর দাসী) বা বিভিন্ন বেশে উপস্থিত হওয়া গদাধরকে নাট্যকার বেশ কৌশলেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'দায়ে পরে দারগৃহ'– জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেছিলেন মলিয়্যারের বিখ্যাত Comedy, 'Le Marriage Force' থেকে। কিন্তু ভীষণ দক্ষ হাতে ফরাসী নাটকটিকে উনি বাঙালীয়ানার ছাঁচে ঢেলেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ন্যায়রত্ন এবং বেদান্তবাগীশের দৃশ্য দুটি নাট্যকার তার রসজ্ঞ মৌলিকতার শুধু পরিচয়ই দেয়নি, সার্থক চরিত্রায়ণ করেছিলেন। মলিয়্যার যেমন সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো হাস্যরস দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তেমনই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর চরিত্রগুলির বাঙালীয়ানার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

একালের সাহিত্য সমালোচক ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী জানিয়রছেন –

> 'বাংলা প্রহসনের লৌকিক ধারার বিজ, কাহিনীর আকাশের মধ্যে উপস্থাপিত গ্রন্থানুবরতি হাস্য রসাত্মক গীত এবং গ্রন্থাতিবরতি স্বাধীন হাস্য রসাত্মক কথোপ কথনের মধ্যে প্রবাহিত।"[৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাস্যরস তৈরির ক্ষেত্রে মলিয়্যার এর সূত্র গুলো কাজে লাগিয়েছেন। বাংলা প্রহসনের ধারাবাহিকতা থেকে বিছিন্ন হয়ে ফরাসী প্রহসনের সূক্ষ্ম Wits ও Humor – কে তিনি দক্ষতার সাথে কাজে লাগিয়েছেন। তাই তাঁর প্রহসন গুলি সমকালীন প্রহসনের ধারা থেকে আলাদা হতে পেরেছে। প্রহসনের ভাষার ক্ষেত্রে ও তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সুদক্ষ ভাবে সংলাপ তৈরিতে সমকালীন বাংলাদেশ বিশেষ করে কলকাতার ভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর রূপান্তরিত প্রহসন গুলি কখনই অ–মৌলিক বলে মনে হয় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন গুলিতে ফরাসী প্রভাব থাকলেও তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আপন মনো ভঙ্গি এবং চরিতের নাম পরিবর্তন, ঘটনার সংস্থাপনের নবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রহসন গুলিকে ফরাসী প্রহসন প্রভাবিত বলে মনে হয় না। তবে মলিয়্যারের বেশ কিছু প্রহসন–কমেডিতে লক্ষ্য করা যায় যে সমাজ গৌণ এবং পরোক্ষ থেকে ব্যাক্তিকে প্রধান ও প্রকট করে তুলেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন গুলিতেও আমরা এমনটি লখ্য করে থাকি। এ ভাবেই ধীরে ধীরে বাংলা প্রহসনে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়– কখন বিষয় দ্বারা অনুপ্রাণিত, কখনও বা ব্যক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত 'প্রহসন' বাংলা সাহিত্যে এক অনড় স্থান দখল করে আছে।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৮, পৃ. ১৭-১৮

২. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, পৌরাণিক নাটক : গিরিশ রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯, পৃ. ৭৩২

৩. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪০, পৃ. ৭৭

৪. বসু, ডা. বিষ্ণু, সমালোচনা সাহিত্য, বাঙলানাট্যরীতি : বিকাশ ও বৈচিত্র, কলিকাতা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৮-৪৪

৫. Scholes and Klaus. Element of Drama. Q.U.P.1971. p. 43

৬. Nicell, A. World Drama. P. 335

৭ .https://letudier.com/dissertation-les-sources-et-la-reception-de-dom-juan-de-moliere-au-fil-des-siecles-1375 (10.02.2023)

৮. Butcher. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Arts. Dover 1951. P. 21

৯. সামন্ত, ড. সমীর, প্রহসনের স্বতন্ত্র শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪, পৃ. ৩৩

গ্রন্থপঞ্জী :

১. বসু, ড. বিষ্ণু, বাঙলা নাট্যরীতি, বিকাশ ও বৈচিত্র, কলিকাতা, ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ১৯৭৭

২. ভট্টাচার্য, ড. প্রভাত কুমার, বাঙলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব ১৮০০-১৯১৪, কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৯

৩. ভাদুড়ী, শিশিরকুমার, বাংলা নাটক, ১৮৫২ - ১৯৫৭, কলিকাতা, রত্নসাগর গ্রন্থমালা, ১৯৫৭

৪. সেনগুপ্ত, ড. প্রদ্যোৎ, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭৬

৫. সামন্ত, ড. সমীর, প্রহসনের স্বতন্ত্র শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪